Vol. 32 | No. 2 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুনীর চৌধুরীর 'কবর'

Volume	32
Issue	2
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন
Published online	February 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v32i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i2.3
Pages	47-63
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মুনীর চৌধুরীর 'কবর'

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন

মুনীর চৌধুরীর একাংকিকা সংগ্রহ 'কবর' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সনে।[১] "মানুষ", "নষ্ট ছেলে" ও "কবর"—এ-তিনটি একাংকিকা স্থান পায় উক্ত নাট্য-সংকলনে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই নাট্যা-মোদী মহলে সাদরে গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের অব্যবহিত আগে ও পরে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা এবং এর ফলে উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষিতে ছাত্রসমাজের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি অবলম্বন করে রচিত হয়েছে 'কবর'-এর একাংকিকা-গুলো। মুনীর চৌধুরীর প্রথম পর্যায়ের রচনা এবং সমসাময়িক ঘটনা ও মানসিক অস্থিরতার এক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে আমাদের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেই কেবল নয় সামাজিক প্রতিচ্ছবি হিসেবেও 'কবর' বিশেষ গুরুত্ববাহী। নাট্যকার নিজেই লিখেছেন : "এই নাটিকাত্রয়ের মধ্যে আমার এবং এদেশের জীবন-চেতনা ও অভিজ্ঞতা-অনুভূতির এবং বিশেষ পর্বের জ্বলন্ত ছাপ পড়েছে, কেবল মাত্র এই কারণেও এই পুরোনো রচনাগুলো সংগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছি।"[২]

২.

'কবর' নাট্য-গ্রন্থের প্রথম একাংকিকা "মানুষ"।[৩] ১৯৪৬ সালের সাম্প্র-দায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত হয়েছে এর আখ্যানভাগ। একদিকে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম অপরদিকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সিদ্ধির প্রেরণাজাত দাঙ্গা। এমনি বিক্ষুব্ধ জটিল ও পারস্পরিক হীন-স্বার্থের কারণে দুই ভ্রাতৃপ্রতিম সম্প্রদায়ের আত্মঘাতী কার্যকলাপের মধ্যে মানবতার বাণী নিয়ে উপস্থিত হলেন নাট্যকার। নাটিকার কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ—সালাম সাহেবের বড় ছেলে মোর্শেদ, মেজ ছেলে ফরিদ; কন্যা জুলেখা, ছোট ছেলে খোকা আর তাদের মাকে নিয়ে সংসার। বড় ছেলে মোর্শেদ ঘরের

বাইরে যাবার পর দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় এবং সে ঘরে ফিরতে পারছে না। তার চিন্তায় সবাই অস্থির হয়ে পড়েছে। পিতা ঘরময় পায়চারি করছেন এবং অদ্ভুত ধরনের সর্বনেশে কল্পনা-মিশ্রিত আশংকা করছেন। যেমন, "আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ওরা ওর কাটা মুণ্ডুকে কাঁসার থালায় সাজিয়ে ফেরি করে বেড়াচ্ছে, ওরা সবাই তাই দেখে বাহবা দিচ্ছে, ফুর্তির খাতিরে মুঠো মুঠো টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার ছেলের নরম সাদা গলা-কাটা লাশের···।"[৪] এবং একই সময়ে জুলেখা নিজেকে অপরাধী ভেবে মানসিক কষ্ট পাচ্ছে এ কারণে যে, মোর্শেদ তারই জন্যে বই আনতে ঘর থেকে বেরিয়েছিল। এদিকে ঘরে ছোট ছেলের অবস্থা খুবই খারাপ। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে মুখের শিরাগুলো নীল হয়ে আসছে। দুবার হাসপাতালে ফোন করেও ফরিদ কোন ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে পারেনি। মা ভাবছেন সবারই জীবনের মূল্য আছে, কেউ দাঙ্গার ভয়ে ঘরের বাইরে আসছেনা—এমনকি ডাক্তারও না। কিন্তু কেবল কি তার ছেলেটারই জীবনের মূল্য নেই। খোকার অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হয়ে উঠলে ফরিদ নিজেই ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বের হতে চাইলে পিতা কঠোর ভাবে বাধ সাধেন। ঠিক একই সময়ে নীচের ঘরে দরজায় শব্দ হলে পিতা খুব আশান্বিত বোধ করে বলে উঠলেন, "মোর্শেদ ফিরে এসেছে, আমার মোর্শেদ বেঁচে আছে, সে আমায় ডাকছে।" কিন্তু ফরিদ দরজা থেকে ফিরে এসে জানালো যে, পাড়ার একজন লোক এসে তাকে খবর দিয়ে গেছে, তাদের পাড়ায় একটি হিন্দু গুণ্ডা ঢুকেছে এবং তাকে একটু আগে বশির উকিলের ছাদে দেখা গেছে। ফরিদ তার বড় ভাইয়ের সর্বনাশের কথা কল্পনা করে পিতা-মাতা-বোনের নিষেধ উপেক্ষা করে পিতার কাছে পিস্তল রেখে ছোরা হাতে ভাইয়ের বদলা নিতে বেরিয়ে যায়। ফরিদ যাবার পর খোকার অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। এমন সময়ে পেছনের জানালা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে ঢোলা পাঞ্জাবী, পরণে ধুতি ও চামড়ার ব্যাগ হাতে এক যুবক। পিতা তাকে চিনতে ভুল করেন নি, তাই পিস্তল তাক করে পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তর দিলো: 'মানুষ'। আব্বা বুঝতে পারলেন একেই সবাই বশির উকিলের ছাদে দেখেছিল এবং খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে আরও জানালো যে, সে দাঙ্গা শুরু হবার পূর্বে কোন এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল এবং দাঙ্গা আরম্ভ হবার পর বন্ধু তাকে আশ্রয় দিতে সাহস পাচ্ছিল না তাই সে দেয়াল টপকে এতদূর এসেছে। এবং এখানেও সে আশ্রয় দাবী করেনা বরং প্রার্থনা করে মাত্র।

এরই মধ্যে অসুস্থ খোকার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং সে নিজে ব্যাগ খুলে ঔষধ বের করে ইনজেকশান দেয়া ইত্যাদি চিকিৎসা করে দেয়। খোকার টনসিলাইটিস হয়েছিল এবং অচিরেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে, এমন অভয় দান করে ডাক্তার হাত ধোবার জন্যে বাথরুমে প্রবেশ করে। ইতি-মধ্যে মরণাপন্ন খোকাকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার কারণে পিতা, মাতা ও কন্যা সবাই আগন্তুকের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময়ে দরজায় আঘাত পড়ে। ফরিদ ঘরে এসে জানালো যে, হিন্দুটাকে নাকি তাদেরই ছাদের কাছাকাছি দেখা গেছে এবং সবাই সন্দেহ করছে যে, সে হয়তো এ বাড়িতে লুকিয়ে আছে, তাই তারা বাড়ি তল্লাশী করতে চায়। প্রথমতঃ সালাম সাহেবের স্ত্রী বাড়ি তল্লাশীর প্রস্তাবে রাজী হলেন না কিন্তু পরে অবস্থা বেগতিক দেখে রাজি হয়ে গেলেন। কারণ সকলের বদ্ধমূল ধারণা গুণ্ডাটা এ বাড়িতেই আছে। পাছে গোলমাল বাঁধিয়ে দেবার ভয়ে তিনি ফরিদকে বাইরে পাঠিয়ে ঘর গোছাবার নাম করে মশারিটা ভালভাবে ফেলে দিয়ে টেবিল ল্যাম্পের শেডটা ঠিক করে নেন। সালাম সাহেব ততোক্ষণে হিন্দু এই নবীন ডাক্তারকে নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি তখন আর আগন্তুককে মরতে দিতে চাননা। তাই হাতের পিস্তল বাড়িয়ে দেন এই বলে যে, "এই ধরো, আমার পিস্তল মুঠ করে ধরো। যে তোমাকে মারতে চাইবে তাকে মারবার অধিকার তোমারও আছে। না লড়ে মরবে কেন"।[৫] মা শরীফ খান্দানের মহিলা; তাই একবার মশারির ভিতর থেকে কথা বললেই চলবে, কেউ মশারি তুলে উঁকি দিয়ে দেখবার প্রস্তাব করতে সাহস করবেনা—এই আত্মবিশ্বাসে তিনি লোকটাকে মশারির ভিতর আশ্রয় দিলেন।

একে একে পাড়ার ছেলেরা ফরিদের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো। তারা সারা ঘর তল্লাশী চালালো। ঠিক এসময়ে ফোন বেজে উঠলে সালাম সাহেব ধরলেন এবং হাসপাতালে কথা বলে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরই মধ্যে বাড়ি-তল্লাশী দল সব ঠিক আছে বলে বিদায় নিল। ফরিদ পিতার কাছে ফিরে এলো, লোকটিও মায়ের সাথে মশারির নীচ থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। ফরিদের প্রশ্নের উত্তরে সে একই উত্তর দিল যে সে একজন 'মানুষ'। গৃহিণীর ভেজা চোখ স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ, জুলেখা ফরিদের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে আর আশ্রয় প্রার্থী ডাক্তার ছোট খোকার পরিচর্যায় রত অবস্থায় একাংকিকার যবনিকাপাত ঘটে।

স্বল্প সংখ্যক চরিত্র নিয়ে একক দৃশ্যের পরিকল্পনায় নির্মিত এ একাংকিকার কাহিনী বেশ ঘনসংবদ্ধ। কাহিনী সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এর ভেতর ভাবের ও চিন্তার গভীরতা প্রগাঢ়। যে সময়ে ভারতবাসীরা ইংরেজের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির সংগ্রামে রত, সে সময়েই দেশের দুটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সদস্যরা আত্মঘাতী হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত। অতি অল্প কথায়, স্বল্প পরিসরে মূল সমস্যাটিকে অবলম্বন করে নাট্যকার পরিকল্পনা করেছিলেন "মানুষ" একাংকিকা। যে অর্থে একাংকিকা ও নাটককে ছোটগল্প ও উপন্যাসের সাথে তুলনা করা হয় সে অর্থে "মানুষ" একটি সার্থক সৃষ্টি। বস্তুত নাট্যকার সাম্প্রদায়িক কলহের বিষবাষ্পের ঊর্ধ্বে মানবতার চিরন্তন বাণী ঘোষণা করার প্রয়াস পেয়েছেন। যুগে যুগে ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক বিবাদ মানুষকে পশুতে পরিণত করেছে কিন্তু এর ভেতরও কোথাও না কোথাও মানবতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে আল্লাহু আকবর ও বন্দে-মাতরম্ ধ্বনির চিৎকারে একাংকিকায় একটি সাম্প্রদায়িক উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনাময় আবহ সৃষ্টি হওয়ায় এর ভাবগাম্ভীর্য ও সাবলীল গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আশ্রয়-প্রার্থী হিন্দু ডাক্তারকে পর্দানশীল মুসলিম মহিলা যে তার বিছানায় মশারির নিচে স্থান দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন, এটা নাটকের স্থূল ঘটনা মাত্র। এর প্রাণ-শক্তি ফরিদদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে, আব্বার সন্দেহ-প্রবণতায়; নাটকে অনুপস্থিত মোর্শেদের মৃত্যুতে, এমনকি রুগ্ন সন্তানের প্রাণদানকারী হিসেবেই ডাক্তারকে বাঁচাবার চেষ্টায় মায়ের সূক্ষ্ম স্বার্থপরতায়। নাটকের মর্মবাণী ডাক্তারের আত্মপরিচয় দানের বাস্তবতায় নিহিত: "আমি মানুষ।"[৬]

৩.

'কবর'-এর দ্বিতীয় একাংকিকা "নষ্ট ছেলে"[৭] ১৯৪৮ কিংবা এর পরবর্তী-কালের এক রাজনৈতিক ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। এতে রাজনৈতিক কারণে আত্মগোপনকারী এক যুবতীর ছদ্মবেশ ধারণের মাধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত প্রখরভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। এর কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ: এরতাজুল করিম সাহেব চালের ব্যবসায়ী, প্রচুর মুনাফা অর্জন করে থাকেন। তার ছোট ভাই এম্রান দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি এক-জন নীতিবিদ। বার-তের বছরের আমিন করিম সাহেবের পুত্র, বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ। জাহাংগীর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় যুবক, যে একবার করিম সাহেবের

জ্যেষ্ঠা কন্যা রাশেদার কাছে অপমানিত হয়েছিল। বর্তমানে পুলিশের দালাল হিসাবে কাজ করে। খোকা ও বুবি করিম সাহেবের কনিষ্ঠ দুই সন্তান। এরতাজুল করিম সাহেবের জ্যেষ্ঠা তনয়া রাশেদা বামপন্থী রাজনীতির কারণে ফেরারী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তাকে ধরার জন্যে দু'হাজার টাকার এনাম ঘোষণা করে দিয়েছে। ঈদের আগের রাতে রাশেদার গোপনে বাড়ি আসার চিঠিকে কেন্দ্র করে ঘটনা এগিয়ে চলে। আমিন এবং অধ্যাপক এম্রান উভয়ের কথোপকথন থেকে বেরিয়ে আসে যে, আমিনের মা রাশেদার জন্যে বেশ কষ্ট পাচ্ছেন এবং অধ্যাপক চাচা যিনি রাশেদার কার্যকলাপ সমর্থন করেন তারও চিন্তার সীমা নেই। যেমন, "এই রাত শেষ হলে কাল সকালে ঈদ। তোমার আপা তোমার মায়ের বড় মেয়ে, প্রথম সন্তান। পুলিশের তাড়া খেয়ে হয়তো কোনো জোলো জংলা ডোবার পাশে বসে শীতে কাঁপছে, মাথায় তেল পড়েনি তিন দিন, হাতখালি, হয়ত দুপুরের খাওয়াই হয়নি, হয়ত এতক্ষণে ধরা পড়ে মার খাচ্ছে, কত কিছুই হতে পারে। ঈদের দিনেও তোমার মা সে মেয়ের মুখ দেখতে পাবেনা।"[৮] এর থেকে বোঝা যায় একটি পরিবার তাদের রাজনৈতিক কর্মী কন্যার জন্যে কতটা উদ্বিগ্ন। অন্যপক্ষে পিতা কন্যার এহেন কার্যকলাপ কিছুতেই সমর্থন করেন না। যেমন, "যে মেয়ে কতগুলো বে-শরিয়তী স্বদেশী বুলির মোহে বেহায়া, বে-আব্রু হয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়ায়—এরতাজুল করিম তেমন মেয়েকে কন্যা বলে স্বীকার করেনা।"[৯] জাহাংগীর স্বাস্থ্যবান বেঁটে যুবক। সে পুলিশের দালালি করে। আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে সে বাড়িতে ঢুকে এবং অধ্যাপক এম্রানের সাথে একথা সেকথা বলে রাশেদার গতিবিধি সম্পর্কে জানতে চাইছে। এমন সময়ে এরতাজ সাহেব ঘরে ঢুকেই বলেন যে, তিনি কিছু পুলিশকে তার বাড়ির পাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন এবং জাহাংগীরের সংগে এসেছ বলে সন্দেহ করছেন। উত্তরে জাহাংগীর জানালো যে, তারা গোয়েন্দা পুলিশের লোক, নিজেরাই এসেছে এবং বাড়ী তল্লাশী করতে চায় কারণ তাদের ধারণা রাশেদা হয়তো-বা বাড়ির ভিতরেই লুকিয়ে আছে। বাড়ি তল্লাশীর কথা শুনে পিতা এরতাজুল করিমের অহংবোধ জেগে ওঠে এবং তিনি বলেন আমার সারা জীবনের গড়া স্বপ্ন, চৌদ্দ-পুরুষের রক্তে তাজা খান্দান—সব এ বাড়ির প্রতি ইঁটের সংগে গাঁথা হয়ে আছে। পুলিশ লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে আজ সেগুলো ঘাটছে। এতবড় বেই-জ্জতীর আগে আমার মৃত্যু হয়নি কেন? বিষ জহর খেয়ে মরে যেতে পারল না মেয়েটা।"[১০] তথাকথিত মেকি আভিজাত্য আর অসৎ ব্যবসায়ের উপর

ভিত্তি করা মূল্যবোধের উত্তরে দর্শনের অধ্যাপক এগ্রান স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল যে, "চালের গুদাম থেকে রোজ তোমার আজকাল যা আয় হচ্ছে তাতে খান্দানের সোনার পাহাড় গড়ে উঠতে আর বেশী দেরী নেই। পুলিশের থানা তল্লাশী হাজার বার ঘুরে ফিরে গেলেও ও চূড়া ছুঁতে পারবেনা।"[১১] এসকল সংলাপের মাঝেই জাহাংগীর একবার জানতে চায় সত্যিই রাশেদা বাড়ির ভেতর আছে কিনা? শেষ পর্যন্ত পুলিশ বাড়ি তল্লাশী করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে এরতাজ সাহেবের ছোট ছেলেকে পুলিশ তাড়া করে নিয়ে আসে। কারণ সে নাকি আমিনের বালিশের নীচ থেকে কি একটা চুরি করে পালিয়ে এসেছে। এর ফলে এরতাজ সাহেব নিজের সন্তানদের ক্রিয়া-কর্মের উপর আরও রেগে যান এবং বলতে থাকেন: "বড়বোন দুশ্চরিত্রা। ছোটটা চোর। যা বলে তোমার গর্ব হচ্ছেনা ওদের জন্য? আর কাঁদবেনা ওদের জন্য?"[১২] শুধু এখানেই শেষ নয়। খোকার পিঠে চাবুক মারতেও পিতা দ্বিধা করেননি। এখানে এরতাজ সাহেব একজন মধ্যবিত্ত পিতার সামাজিক মর্যাদাবোধ ও বাৎসল্য আকর্ষণের টানাপোড়েনে আন্দোলিত। খোকা চুরি করে এনেছিল এক টুকরো কাগজ, যার মধ্যে আজ রাতে তার বোনের বাড়ী আসার কথা লেখা ছিল। আর সে গন্ধ পেয়েই হয়তোবা পুলিশ সওয়ার হয়েছে। অতি দ্রুত সে কাগজ নিয়ে এসে খোকা মায়ের হাতে দিতে পেরেছিল যার ফলে বিরাট একটা সংবাদ বা আসন্ন অপ্রীতিকর পরিস্থিতিকে সাময়িকভাবে চাপা দিতে পেরেছিল। এখানে নাটিকার প্রথম দৃশ্য শেষ হয়ে যায়, তবে শেষ হবার পূর্বে পিতা জ্যেষ্ঠ ছেলে আমি-নের প্রশংসা করেন এবং তার কাছে একটা টাকার প্যাকেট রাখার জন্যে দিয়ে যান। উপরোক্ত ঘটনাটি জাহাংগীর দেখে ফেলে যার ফলে পরবর্তী দৃশ্যে এ ঘটনার সূত্র ধরে জাহাংগীর নাটিকার পরিণতিতে তার নিজস্ব ভূমিকা আরও স্পষ্ট করে তোলে। নাটিকার দ্বিতীয় দৃশ্যে আমিন, খোকা ও বুবি তিনজনা মিলে গভীর রাত অবধি গোপনে বসে বসে তাদের ফেরারী বোনের আগমন প্রত্যাশা করছে। রাত নিস্তব্ধ নীরব হয়ে এলে রাশেদা ঘরে ঢোকে। ভোরে ঘরে ঘরে ঈদের আনন্দ বইবে কিন্তু সে রাজনৈতিক কারণে আজ অন্য জগতের মানুষ। তাই কোন আত্মীয় স্বজনদের সাথে যোগ দেয়ার সুযোগ নেই তার। তাই সে নিয়ে এসেছে ছোটদের জন্যে উপহার। সবার উপহার পেঁৗছে দেবার পর সে ছোটভাই আমিনের কাছে এক ভিক্ষা চায়। আমিনও বোনের দাবির মুখে প্রতিশ্রুতি দেয়—"আগামীকাল ঈদ, হাজার হাজার লাখ লাখ লোক কালও রোজা রাখবে কারণ তাদের ঘরে খাবার নেই।

নামাজ পড়তে যেতে পারবেনা, কারণ কাপড় নেই। ঘর থেকে বেরুতে পারবেনা, ক্ষুধায়, লজ্জায়। তাদের জন্যে লড়াই করবি তুই ?"[১৩] বোন তার ভাইকে আরও অনুরোধ জানায় যেন সে অন্ততঃ তার ছোট্ট মুষ্টি দিয়ে কয়েক জনের ক্ষুধা মেটায়। বিপ্লবী বোন ও ভাইয়ের মধ্যে যখন এ ধরনের সাম্য-বাদী কথাবার্তা চলছিল সে সময়ে দরজায় আঘাত পড়ে। জাহাংগীর মাথায় হ্যাট, গায়ে গ্রেট কোট পরে বাইরে থেকে জানায় যে, সে একা এসে এবং রাশেদা যেনো না পালাবার চেষ্টা করে। জাহাংগীর ঘরে প্রবেশ করার পর আমিনকে অন্য ঘরে যেতে বলে এবং রাশেদাকে একা পেয়ে বলতে থাকে: "আমি যদি পনের মিনিটের মধ্যে এঘর থেকে বেরিয়ে না যাই তাহলে বাইরে যারা লুকিয়ে আছে তারা ধরে নেবে যে, তুমি বাড়ির ভেতরই আছ এবং মুহূর্তের মধ্যে এ বাড়ি এমন ভাবে ঘেরাও করে রাখা হবে যে, একটা মশাও বার হবার পথ খুঁজে পাবেনা।"[১৪] এ রকম একটা ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির আভাস দিয়ে জাহাংগীর নিজের আগমনকে জরুরী করে তোলে এবং হাতে সময় খুব বেশী একটা নেই বলে তার অসুন্দর মনোভাব প্রকাশ করে। সে রাশেদার কাছে টাকা দাবি করে। সে জানে আমিনের বালিশের নীচে এরতাজ সাহেবের টাকার প্যাকেট আছে তাই সে ওই টাকাটাই আত্ম-সাৎ করতে চাইলো। ঠিক এমনি সময়ে আড়াল থেকে আমিন এসে জাহাংগীরের মাথায় পেপারওয়েট দিয়ে আঘাত করে যার ফলে জাহাংগীর অচেতন হয়ে পড়ে যায়। সাথে সাথে তারা জাহাংগীরের চেতনাহীন দেহটা টেনে নিয়ে যায় পাশের গুদাম ঘরে। এরই মধ্যে পুলিশ বাঁশি বাজাতে শুরু করে। রাশেদা জাহাংগীরের হ্যাট কোট পরে জাহাংগীর সেজে পুলিশের সামনে দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। আমিন বোনের বোরখা পরে বেরিয়ে যাবার সময়ে তার পায়ে পুলিশের গুলি লাগে। এরই মধ্যে পুলিশ বুঝতে পারে আসল আসামী পালিয়ে গেছে। জাহাংগীর বেরিয়ে আসে স্বল্প বস্ত্রে এবং বোরখা পরিহিতাকে রাশেদা ভেবে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে কিন্তু পরক্ষণেই বোরখার অভ্যন্তরে আমিনকে দেখে আঁৎকে উঠে। এখানেই নাটিকার যবনিকাপাত ঘটে। যুগে যুগে প্রগতিশীল বিপ্লবীরা সনাতনপন্থী কিংবা তথাকথিত আভিজাত্য আর সংরক্ষণবাদীদের কাছে উচ্ছন্নে যাওয়া, বিপথ-গামী কিংবা নষ্ট বলে আখ্যায়িত হয়েছে। নাটিকায় এরতাজুল করিম সাহেব মধ্যবিত্তের নির্ঝঞ্ঝাট নিশ্চয়তা প্রত্যাশী। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর মুনাফা অর্জন করছেন আর স্ফীত অর্থের সাথে সাথে খান্দানের কদর সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠছেন। নাট্যকার অত্যন্ত কুশলতার সাথে নাটকের ঘটনাকে

পর্যায়ক্রমিক ভাবে পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন। তরুণ এবং তারুণ্যকে দেয়া হয়েছে বিশেষ প্রাধান্য। জাহাংগীর স্বার্থপর, লোভী দালাল। নাট্যকার ইচ্ছা করে সে রাতে রাশেদাকে পুলিশের কাছে আত্ম-সমর্পণকারিণী গুলিতে আহত কিংবা নিহত দেখিয়ে করুণ রস সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু জাগ্রত নারীসমাজ ও তাদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করাকে তিনি পরাজিত কিংবা হেয় প্রতিপন্ন হতে দেননি। এর ভেতর দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি নাট্যকারের সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ রাশেদার মত বিপ্লবী এবং প্রতিবাদী মহিলা রাজনৈতিক কর্মীর চরিত্র সৃষ্টি নাট্যকারের প্রগতিশীল দৃষ্টিভংগির পরিচায়ক। "সংক্ষিপ্ত এই একাংকিকার মধ্যে মানুষের অধিকার আদায়ের পথে আপার ত্যাগ বিপ্লবী আদর্শের প্রতীক। স্বদেশী আন্দোলনের কালে এমনতর অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। নাট্যকার সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাস্রোতের একটি বাস্তব আলেখ্য এখানে তুলে ধরেছেন।"[১৫] স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে মুনীর চৌধুরী এখানেও হাস্যরস পরিবেশন করার সুযোগ নিয়েছেন। শুধু হাস্যরস সৃজনই নয়, এর ভেতর দিয়ে তিনি একটি নাট্যকুশলতাকে কাজে লাগিয়েছেন। গায়ে শুধু গেঞ্জী, পরণে ঢোলা জাংগিয়া, পা খালি আর শক্ত করে নিজের মাথা টিপে ধরে জাহাংগীর যখন এসে বলে "শয়তান দুটো আমার কোট নিয়ে গেছে, হ্যাট নিয়ে গেছে, প্যান্ট নিয়ে গেছে, আমায় নাংগা করে—এ্যাঁ ?"[১৬] এ প্রসংগে ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন "ছদ্মবেশের অবতারণা করে বিশেষ নাটকীয় কৌশল এতে প্রয়োগ করা হয়েছে, তার মূলে শেকস্‌পীয়রের প্রভাব কার্যকর ছিল। মুনীর চৌধুরীর আরো কয়েকটি নাটকে ছদ্মাবরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে।"[১৭]

৪.

'কবর' গ্রন্থের তৃতীয় একাংকিকার নাম "কবর"। ভাষা-আন্দোলন আমাদের জীবনে-সমাজে ও সাহিত্যে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ১৯৪৮ সালে আমাদের মাতৃভাষার উপর প্রথম আঘাত আসার পর থেকে তৎকালীন ঢাকার ছাত্র সমাজ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক আন্দোলন সারা দেশের আন্দোলন হিসাবে রূপ নেয়। ক্ষমতাসীন সরকার গ্রেপ্তার, ১৪৪ ধারা জারী, এমনকি গুলিবর্ষণ করতেও দ্বিধা করেনি। ধর্মীয় ঐক্যের পাশাপাশি ভাষাগত ঐক্য সৃষ্টি করে পাকিস্তান সরকার চেয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে। কিন্তু স্বাধীনচেতা, মুক্তিকামী বাংগালীরা

তা মেনে নেয়নি। সে কারণে বাংগালী জাতিকে অনেক ত্যাগ, অনেক রক্ত দিতে হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মতো এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায় রচিত হয়েছে "কবর" একাংকিকা। "বন্দী অবস্থায় মুনীর চৌধুরী দুবছরেরও বেশী সময় অতি-বাহিত করেন দিনাজপুর ও ঢাকা জেলে। তাঁর এবারের কারা-জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল "কবর" একাঙ্কিকা। ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে রাজবন্দীরা যাতে ঢাকা জেলের মধ্যে অভিনয় করতে পারেন, এমন একটি নাটক লিখতে তাঁকে অনুরোধ জানান আরেক রাজবন্দী রণেশ দাশগুপ্ত। "কবর" তার ফল।"[১৮] মাতৃভাষার আন্দোলন সেদিন প্রায় প্রত্যেকটি বাংগালীর হৃদয়েই বিদ্রোহের সূচনা করেছিল এবং সে বিদ্রোহের উত্তাপ বুকে নিয়েই মুনীর চৌধুরী জেলখানায় বসে রচনা করলেন "কবর"। কবরে চরিত্র সংখ্যা কম এবং কাহিনী বেশ সংবদ্ধ। একজন রাজনৈতিক নেতা, একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর, একজন পাগল, গার্ড এবং কয়েকটি ছায়া-মূর্তিকে নিয়ে এর ঘটনা। একাংকিকার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে একটি গোর-স্থানে। সময় হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে শেষ রাত্রিকে। দিনের বেলায় ছাত্র আন্দোলন হয়েছে। পুলিশ গুলি চালিয়েছে। আন্দোলনকারীদের কয়েকজন নিহত হয়েছেন। রাজনৈতিক নেতা তথা সরকারী দালাল এই লাশগুলোকে রাতের আঁধারে কবরস্থ করার অভিপ্রায়ে গোরস্থানে নিয়ে এসেছে। কারণ, নেতা লাশগুলো সামলানোর ব্যাপারটি ইনস্পেক্টর এবং গোর-খুঁড়েদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। গোরস্থানে এসে নেতা মদ্যাসক্ত হয়ে পড়ে এবং সাথে সাথে ইনস্পেক্টর হাফিজও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। লাশগুলো পোস্টমর্টেম করার ফলে এবং ট্রাকে করে বহন করে নিয়ে আসার সময়ে ঝাঁকুনিতে এলোমেলো হয়ে যায়, যার ফলে কোন্টা কার অংশ তা সনাক্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ কারণে হাফিজ সবগুলো লাশ একই গর্তে মাটিচাপা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু গোর-খুঁড়েদের আপত্তিতে তা আর করা হয়নি। ইনস্পেক্টর নিজের কার্যকারিতা ও সরকারের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে নেতাকে খুশী করার চেষ্টা করে। "মেহেরবানী স্যার! পাকিস্তান হবার পর আমরা পেটি-অফিসাররাই কেবল কিছু পেলামনা। বৃটিশ আমলেও সমাজে মিশতে পারিনি। পাকিস্তানের জন্য এত ফাইট করে, আমাদের এখনও সেই দশা। যদি আপনারাও আমাদের দিকে ফিরে না তাকান আমরা বাঁচব কি করে? আমাদেরত কোন রাজনীতি নেই স্যার। সরকারই মা-বাপ। যখন যে দল হুকুমত চালায় তার হুকুমই তামিল করি।"[১৯]

এরই মধ্যে মুর্দা ফকির এসে কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সে এক বদ্ধ পাগল। দিনরাত গোরস্থানেই পড়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে কবরের সাথে কথা বলে। তাই তাকে সবাই মুর্দা ফকির নামে ডাকে। এই ফকির এক জন ভাল আলেম। গ্রামের স্কুলে মাস্টারী করতো। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে তার ছেলে-মেয়ে, মা-বৌ সবাই মরেছে কিন্তু কেউ কবর পায়নি। মুর্দাগুলো পচেছে, শকুনে খেয়েছে, রাতে শেয়াল এসে টেনে নিয়ে গিয়েছে। এরপর থেকেই সে পাগল এবং সারাক্ষণ গোরস্থানেই থাকে। কারণ তার ভয় হলো মারা গেলে পাছে কেউ যদি কবর না দেয়? তাই সে এখানেই থাকে, যাতে মরার সময় হলেই চট্ করে কবরে ঢুকে যেতে পারে। মুর্দা ফকিরের চেঁচামেচির কারণে ইনস্পেক্টর মুর্দাগুলো দ্রুত মাটিচাপা দিতে পারেনি তাই সে নেশার ঘোরে একেকবার ফকিরকেসহ মাটিচাপা দেবার কথা ভেবেছে। অথচ তাদের ভয়ের সীমা নেই যে, ফকির যদি লাশগুলো দেখে ফেলে আর জন-সাধারণের কাছে প্রকাশ করে দেয় তাহলে কি হবে? "মুর্দা ফকির ঝড়ও বোঝেনা, আগুনও বোঝেনা। ও ত একরকম কবরের বাসিন্দা। ভাষার দাবীতে মিছিল বেরিয়েছিল বলে পুলিশ গুলি করে কয়েকটাকে খতম করে দিয়েছে—এত কথা বোঝবার মত জ্ঞানবুদ্ধি ওর নেই। লাশ দেখলেই ও মুখের মধ্যে ভাত গুঁজে দিতে চায় কারণ ওর ধারণা, মানুষ শুধু একরকমেই মরতে পারে, খেতে না পেয়ে।"[২০] এতেও নেতার ভীতি কমেনা। নেতা বলেই তার অগ্রপশ্চাৎ এত ভাবনা। "কিন্তু লাশগুলো কোথায় কবর দেয়া হচ্ছে তাতো ও দেখেছে। সকাল বেলা যদি কাউকে আংগুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেয়? লাশ নিয়ে মিছিল করতে না পেরে ক্ষেপে গিয়ে সকাল বেলা যদি ছাত্ররা এখানেও খোঁজ করতে আসে?"[২১] এর মধ্য মুর্দা ফকির গোপনে গিয়ে ট্রাকের ভিতর লাশগুলো দেখে আসে এবং সে বুঝতে পারে এগুলো কিসের মরা। তাই নিয়ে সে তর্ক শুরু করে দেয় নেতা ও ইনস্পেক্টরের সাথে। "বাসি মরার গন্ধ আমি চিনিনা? এ লাশের গন্ধ অন্য রকম। ওষুধের গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নীচেই মাটিচাপা দাওনা কেন— এ মুর্দা থাকবেনা। কবর ভেংগে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।"[২২] এমনকি মুর্দা ফকির নেতা ও ইনস্পে-ক্টরের গা শুঁকে বলতে থাকে যে, লাশগুলো নয় বরং এরাই মৃত। কারণ এদের গা থেকেই লাশের গন্ধ বেরিয়ে আসছে। এ সকল কথার পর মুর্দা ফকির লাশগুলোকে কবর থেকে ডেকে উঠিয়ে নিয়ে আসবে বলে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এর মধ্যে নেতা ও ইনস্পেক্টর আরও কয়েকবার

সুরা পান করে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তাদের মনে নানা উদ্ভট চিন্তার তোলপাড় চলতে থাকে। তারা ভাবতে থাকে যদি মুর্দা ফকির লাশ-গুলোকে কবর থেকে উঠিয়ে নিয়ে মিছিল করতে করতে এগিয়ে আসে? এমনি সময়ে অন্ধকার হতে তাদের দিকে একটা বুলেট ছুটে আসে। এরা ভয় পেয়ে শুয়ে পড়ে। রক্ত মাখা বুলেট খুঁজে পেয়ে তারা বুঝতে পারে যে, এটা মুর্দা ফকিরেরই কারসাজি। সে পোগনে ট্রাকে গিয়ে বুলেট খুঁজে এনে তাদের প্রতি ছুড়ে মেরেছে। তখন তারা আশে পাশে তাকিয়ে ফকিরকে খুঁজতে চেষ্টা করলো। কিন্তু মাতাল অবস্থায় তারা ভাবতে থাকলো যেনো লাশগুলোরই কোন একটা তাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। এখানে নাট্য-কার একটা আধিভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন। আসলে ফকিরই বলে যাচ্ছে যে, সে কবরে যাবেনা। আর, এপক্ষ থেকে নেতা ও ইন-স্পেক্টর প্রাণপণে লাশকে বোঝাতে চাইছে যে তার কবরে ফিরে যাওয়া উচিত—। "জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাওনি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাওনা। তোমার মত ছেলেরা মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছোনা। তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, দীনের নামে, যারা এখনো মরেনি তাদের নামে মিনতি করছি–তুমি যাও, যাও, যাও"।[২৩] এসকল কাকুতি মিনতিতে কাজ হবেনা দেখে ইনস্পেক্টর হাফিজ কৌশল পাল্টালো। কল্পিত ছায়ামূর্তি বলতে চাইছে যে, সে কবরে যাবেনা বরং বেঁচে থাকতে চায়। তাই হাফিজ চাদর খুলে মেয়েদের ন্যায় শাড়ি বানিয়ে পরলো। এবার সে নিহতদের মা সেজে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো যাতে ছায়ামূর্তিরা সুবোধ বালকের মতো সুড় সুড় করে কবরে চলে যায়। কিন্তু ইনস্পেক্টর হাফিজের মাতৃসুলভ অনুরোধে কোনই ফল হলোনা। ছোট ছেলেকে যে ভাবে মায়েরা কোলে নিয়ে আদর করে সে-ভাবে এবার হাফিজ চেষ্টা করতে লাগলো। "আমি যাবোনা। আমি বাঁচবো, মা। বৃষ্টিতে ভেজা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে আমি আরো হাঁটবো মা। ঠাণ্ডা রুপোর মত পানি চিরে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটবো মা।"[২৪] এতো চেষ্টা করেও যখন ইনস্পেক্টর হাফিজ কল্পিত ছায়ামূর্তিকে কবরে পাঠাতে পারছেনা তখন নেশাগ্রস্থ নেতা তার স্বভাব-সিদ্ধ ভংগিতে ক্ষেপে যায়। "ইনস্পেক্টর! আমি এসব মানিনা। আমি সব পুঁতে ফেলব। হাজার হাজার হাত মাটির নীচে সব পুঁতে ফেলবো।

যাতে কোনদিন আর উঠতে না পারে। ভয় দেখাতে না পারে। গুলী, সবগুলোকে আবার গুলী কর। গার্ড, গার্ড"।[২৫] এসময়ে মুর্দা ফকির নিজের কয়েকটা রক্ত মাখা বুলেট নেতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নেতাকে লোড করতে বলে এবং সে মৃতদেরকে ডেকে মিছিল করতে করতে নিয়ে আসার জন্যে চলে যায়। দূরে অন্ধকারে মুর্দা ফকিরের কণ্ঠ শোনা যায়। সে নিহতদের আহ্বান করছে যাতে তারা কবর ছেড়ে উঠে মিছিল করতে করতে এদিকে এগিয়ে আসে কারণ আজ গুলী হবে, এদিকে গুলী হবে। মুর্দা ফকিরের স্বর ধীরে ধীরে শূন্যে মিলিয়ে যাবার পর গার্ড এসে সজোরে স্যালুট করলে নেতা এবং ইনস্পেক্টর হাফিজের নেশা ভেঙ্গে যায়। গার্ড জানালো সবকাজ হয়ে গেছে এবং কারফিউ শেষ হবার বেশী বাকী নেই। নেশামুক্ত হবার কারণে নেতা বুঝতে পারে যে, সারারাত ধরে সে ইনস্পেক্টর হাফিজের সাথে যা করেছে সবই কাল্পনিক এবং উদ্ভট। এখানেই "'কবর" নাটিকার সমাপ্তি ঘটে।

৫.

"কবর" নাটিকার কাহিনী বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের জন্যে মিছিলকারী ছাত্রজনতার উপর সরকারী বাহিনীর গুলি চালনা, গুলিতে নিহতদের রাতের আঁধারে গুম করে নিয়ে সরকারী নেতার প্রহরায় মাটিচাপা দেয়া এবং সরকারী কর্মচারী ও নেতার মদ্যপানের ফলে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কিছু কথার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। মুনীর চৌধুরীর এই নাটিকায় মার্কিন নাট্যকার আরউইন শ'র 'বেরী দ্য ডেড' (১৯৩৬) **(Bury the Dead)**-এর ছায়া পড়েছে। তবে আরউইন শ'র চেয়ে মুনীর চৌধুরীর এ নাটিকা বেশী সংহত এবং ব্যঞ্জনাময় বলে মনে হয়। "মার্কিন নাট্যকারের রচনায় মহাযুদ্ধে নিহত তরুণ সৈনিকেরা কবরে যেতে অস্বীকার করে, মুনীর চৌধুরীর নাটিকায় ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা। ঐ নাটকে সৈন্যদেরকে সমাধিস্থ হবার প্ররোচনা দানের জন্যে ডেকে আনা হয় তাদের স্বজনদের, "কবরে" এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মা ও স্ত্রীর অভিনয় করে পুলিশ ইনস্পেক্টর। এই ভাবগত ঋণ সত্ত্বেও "কবরে" মুনীর চৌধুরীর উদ্ভাবন-নৈপুণ্য ও রচনা-কুশলতার পরিচয় সুস্পষ্ট। বেরী দ্য ডেড-এ মৃত সৈনিকদের বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ ও বাস্তবরূপে উপস্থাপিত।"[২৬] ভাষা আন্দোলনকারীদের ন্যায্য সংগ্রামকে দাবিয়ে দেবার কারণে মিছিলের উপর গুলি করা এবং তাদের মৃতদেহ গোপনে মাটিচাপা দেয়া যে একটি অন্যায়,

গর্হিত এবং পাপপূর্ণ কাজ তা এর সমর্থক এবং কার্যকারীদের মনে পুরো-পুরিভাবে জাগ্রত ছিল। ব্যক্তিগত হীন স্বার্থ এবং সুযোগ সুবিধা লাভের জন্যে এ ধরনের পদলেহীরা যুগে যুগে অন্যায় অবিচারের সাথে আপোষ করে থাকে, যদিও তারা তাদের দুষ্কর্মের ব্যাপারে অবহিত থাকে। তাই আমরা দেখতে পাই কবর নাটিকায় ভণ্ড নেতা ও পুলিশ ইনস্পেক্টর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিভিন্ন কথোপকথনের ভিতর দিয়ে নিজেদের মনের ভয়–ভীতি এবং কাল্পনিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। তারা জানে মাতৃভাষার জন্যে প্রাণ উৎসর্গকারী বিপ্লবীরা নেহায়েৎ মাটি চাপা পড়ে থাকতে পারেনা। তারা একদিন উঠে আসবেই। কারণ তাদের আদর্শ, তাদের ত্যাগ জন্ম দেবে অসংখ্য প্রতিবাদী বীর। এখানেই নাট্যকার বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। নাট্যকার আধিভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বাস্তব এবং কল্পনার মিশ্রণে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য সৃজনের ভেতর দিয়ে নাটিকার যবনিক-পাত করেছেন। সবশেষে গার্ডের সজোরে স্যালুটের মাঝ দিয়ে নেতার নেশা ভেংগে যায় এবং সে জানতে পারে সকাল হবার আর বাকি নেই। এ যেনো "ক্ষুধিত পাষাণ"-এর পাগলা মেহের আলীর "সব ঝুট হায়"–এর মতো। "কবর" নাটিকায় নেতা ও পুলিশ ইনস্পেক্টর, নিজ নিজ শ্রেণীগত প্রতিনিধিত্ব ও আপন চরিত্র পরিস্ফুটনে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। নেতা ও পুলিশ যেন চিরায়ত কালের প্রতিনিধি। আমরা যুগে যুগে এমন নেতা, ইনস্পেক্টর ও সংগ্রামরত-মারখাওয়া ছায়ামূর্তি খুঁজে পাবোই। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রাণদানকারী বিদেহী আত্মারা তাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে ভেসে বেড়ায়। "কবরে" আমরা এ ধরনের কিছু আত্মার পরিচয় পেলাম। নাট্যকার এক বিশাল অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করে তাদের মুখে ভাষা দিয়ে নিজের বুকের অদম্য সংলাপকে প্রকাশ করেছেন। ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভাষ্যের সাথে "কবর" নাটিকার বেশ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, "প্রায় বেলা ২টা পর্যন্ত মিছিল করে ছাত্ররা বীরত্বের সংগে গ্রেফতারী পরো-য়ানা বরণ করতে লাগলো। তখন ধীরে ধীরে ছাত্ররা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে, মেডিকেল কলেজ গেটে ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে গিয়ে জমায়েত হতে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে শ্লোগান দিয়ে বের হতেই উদ্যত পুলিশ বাহিনী এসে তাড়া করে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটার সময় এম. এল. এ. ও মন্ত্রীরা মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে দিয়ে পরিষদে আসতে থাকে। ছাত্ররা যতই শ্লোগান দেয় আর মিছিলে একত্রিত হয় ততই পুলিশ তাদের হানা দেয়। কয়েকবার ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছাড়ল আর

তাড়া করতে করতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভেতর ঢুকে পড়ল। হোস্টেল প্রাংগণের ভেতরে ঢুকে ছাত্রদের উপর আক্রমণ করায় ছাত্ররা বাধ্য হয়ে ইঁট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। একদিকে ইঁট-পাটকেল আর অন্যদিক থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠিচার্জ আসে। পুলিশ তখন দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনা-স্থলেই আব্দুল জব্বার আর রফিকউদ্দিন আহমদ শহীদ হন। আর ১৭ জনের মত গুরুতরভাবে আহত হন। তাদের হাসপাতালে সরানো হয়। তাদের মধ্যে রাত আটটার সময় আবুল বরকত শহীদ হন।"[২৭] আমাদের জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলন শুধু একটি ঘটনাই নয় বরং এর একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে যা পরবর্তীকালে এক মহাবিপ্লবের সূচনা করে-ছিল। মুনীর চৌধুরীর এ নাটিকায় গোরস্থানের যে দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথেও ঐতিহাসিক সত্য জড়িত আছে। যেমন, "২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৭টায় আমরা সকলে জানাজা পড়বার জন্য কলেজে যাই এবং সাথে সাথে গোলাম মাওলা ও কয়েকজন ছাত্র দৌড়ে এসে আমাদিগকে জানাল যে এনাটমি রুমে কোন মৃতদেহ নাই। এনাটমি রুমের সামনে গিয়া দেখি তালা বন্ধ। গোলাম মাওলা ও গাজিউল হক প্রিন্সিপাল সাহেবকে আনতে গেল। আধ ঘণ্টা পর প্রিন্সিপাল সাহেব আসলেন। তাঁহার মুখের অবস্থা দেখে মনে হয় যেন অপরাধী সেজেই তিনি এসেছেন। অশ্রু-সিক্ত নয়নে অতীব দুঃখের সহিত তিনি জানালেন যে, রাত্রি একটার সময় পশ্চিম পাকিস্তানের পশুশক্তির দালালদের নির্দেশে কুর্মিটোলা সামরিক ক্যান্টনমেন্ট হতে জনৈক মেজরের তত্ত্বাবধানে সামরিক বাহিনীর লোকজন মেডিকেল কলেজ হাস-পাতাল প্রাংগণে অনধিকার প্রবেশ করতঃ মিলিটারী গাড়ীতে করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এনাটমি রুম হতে ছয়টি মৃতদেহ নুরুল আমিন সরকা-রের আদেশ মোতাবেক নিয়া যায়। সৈন্য বিভাগের লোকজন ইহাও জানাচ্ছে যে কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে উক্ত মৃতদেহ আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করবার জন্য আদেশ দিয়াছে। (বলা বাহুল্য রাতের অন্ধকারে)।"[২৮] এ থেকে বোঝা যায় মুনীর চৌধুরীর নাট্য পরিকল্পনায় ৫২ সালের ভাষা আন্দোলন কতোটা প্রত্যক্ষভাবে স্থান পেয়েছে। মুনীর চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী অন্যান্যদের সাথে তিনিও নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়েছিলেন। "কবর" নাটিকার তিনটি একাংকিকাই জীবনঘেষা। তিনটি একাংকিকাতেই অসম্ভব রকমের ভাবগভীরতা বিদ্যমান। "মানুষ"-এ তিনি সাম্প্রদায়িক দাংগার মতো একটি

জীবন্ত বিষয়কে অবলম্বন করে তাতে স্নেহ-ভালবাসা-মায়া-মমতার পরশ দিয়ে তাকে করে তুলেছেন অনবদ্য। তিনি যে সাম্প্রদায়িকতাকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সেই একই সাম্প্রদায়িকতা উপমহাদেশে এ যুগেও কোথাও না কোথাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এতে প্রমাণিত হয় তাঁর চিন্তা-ধ্যান-ধারণা কালের প্রান্তে আজো টিকে আছে। অর্থাৎ সমাজের এমন একটি জটিল বিষয়কে নিয়ে তিনি "মানুষ" রচনা করেছেন, যা যুগে যুগে টিকে থাকারই সম্ভাবনা বেশী। কারণ যতদিন ধর্ম থাকবে ততোদিন ধর্মভিত্তিক কোন্দল থাকবে কি থাকবেনা এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায়না। তবে একথা বলা যায় যে, শতো কোন্দল আর ধ্বংশ-যজ্ঞের মাঝেও বিশ্বের কোথাওনা কোথাও মানবতা জেগে উঠবেই। "নষ্ট ছেলে" একাংকিকাও ছোট খাট একটি জীবন্ত ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। শোষক এবং শোষিত এ দুইয়ের দ্বন্দ্ব যুগে যুগে বিভিন্নরূপে এ বিশ্বে থাকবে এবং রাশেদার মতো আত্ম-গোপনকারী কর্মীর সাক্ষাৎও আমরা পাবোই। নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে "নষ্ট ছেলের" মাধ্যমে তার রাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। "মানুষ" এবং "নষ্ট ছেলে" উভয় নাটিকাতেই তিনি শিল্প কুশলতার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করেছেন। "কবর" একাংকিকাতেও নাট্যকার সমসাময়িক ঘটনাকে অবিস্মরণীয় ভাবে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। এক কথায় নাট্যকার 'কবর' নাটিকার তিনটি একাংকিকাতেই স্বল্প পরিসরে বৃহত্তরের ব্যঞ্জনা এনেছেন। "কবর" নাটিকায় স্বল্প পরিসরে এক মহানাট্যিক দ্যোতনা সৃষ্টির মাধ্যমে মুনীর চৌধুরী মহাকালের ইতিহাসে নাট্যকার হিসাবে নিজের পরিচয় অমর করে যেতে সক্ষম হয়েছেন। এ নাটিকাতেই যেনো তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো নিজের বাস্তব কবর সম্পর্কে ইংগিত করে গেছেন। এ-সম্পর্কে অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"শুনেছি মহৎ স্রষ্টা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হন, মুনীর চৌধুরী 'কবর' নাটকে কি তার নিজের এবং মাতৃভূমির ভবিষ্যতের ইংগিত ছিলনা ? 'কবর' নাটক রচনার মাত্র বিশ বছরের মধ্যেই কি ঘটে গেল এদেশে আর তার নিজের জীবনে? স্মরণ করুণ 'কবর' নাটকের সে দৃশ্যের কথা, যেখানে নেতা তার অনুচরকে বলছে লাশগুলোকে তিনি হাজার হাজার হাত মাটির নীচে পুঁতে ফেলবেন, যাতে কোনদিন আর ওগুলো উঠে আসতে না পারে, যাতে লাশগুলোর কোন চিহ্ন বা লেশ না থাকে। বায়ান্ন সালের 'কবর' নাটকের ঐ দৃশ্য কি একাত্তর সালে সত্য হয়ে উঠলনা যেখানে পাকিস্তানী নরপশুরা অগণিত গণসমাধিতে লক্ষ লক্ষ বাংগালীর

মৃতদেহকে পুঁতে ফেলল। যে সব গণসমাধি থেকে বহুদিন অবধি হাজার হাজার নরকংকাল বেরিয়ে আসছিল। আর 'কবরের' রচয়িতাও হয়তো স্থান পেয়েছিলেন অমনি এক গণসমাধিতে, যার কথা তিনি 'কবর' নাটকে লিখে গেছেন কত আগে। তিনি কি 'কবর' রচনার সময় নিজের অজান্তে আপন নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'কবর' নাটকের সে দৃশ্যের কথাও স্মরণ করুণ যেখানে লাশগুলো জীবন্ত হয়ে কবর থেকে উঠে আসছে আর বলছে, 'মিছে কথা মা। আমরা কেউ মরতে চাইনি মা। আমি বাঁচবো মা। আমি কিছুতেই মরবনা।' একাত্তর সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী নর-পশুরা আর তাদের অনুচর বদর বাহিনীর পিশাচরা আমাদের শত শত বুদ্ধিজীবী ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে, পাশবিকভাবে হত্যা করল। হত্যার আগে কারও চোখ উপড়ে নিল, কারও হৃদয়-পিণ্ড উৎপাটিত করল, কারও মাথা থেকে মগজ বের করে নিয়ে শিরচ্ছেদ করল, তারাওতো কেউ মরতে চায়নি, তারাওতো বাঁচতে চেয়েছিল, তারাওতো অসীম আকুলতায় স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করছিল। মুনীর চৌধুরীও মরতে চাননি, তিনিও বাঁচতে চেয়েছিলেন, স্বাধীন দেশে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছিলেন, সে কথাইতো তিনি 'কবর' নাটকে লিখে গেছেন।"[২৯]

তথ্য-নির্দেশ

১ মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, গ্রন্থ পরিচিতি দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৫১৯

২ 'কবর' নাট্যগ্রন্থের ভূমিকা।

৩ প্রকাশকাল : ৯ মার্চ ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ।

৪ মানুষ (কবর), মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬

৫ ঐ, পৃষ্ঠা ১২

৬ আনিসুজ্জামান, মুনীর চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৪৫

৭ প্রকাশকাল : ২৩ আগস্ট ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ।

৮ নষ্ট ছেলে (কবর), মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮

৯ ঐ, পৃষ্ঠা ২০

১০ মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০

১১ ঐ

১২ ঐ, পৃষ্ঠা ২২

১৩ ঐ, পৃষ্ঠা ২৮
১৪ ঐ, পৃষ্ঠা ৩০
১৫ মুহম্মদ মজিরউদ্দিন, বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, পৃষ্ঠা ৪৭১
১৬ মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২
১৭ মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১২
১৮ ঐ, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৫
১৯ ঐ, পৃষ্ঠা ৪২
২০ ঐ, পৃষ্ঠা ৪৪
২১ ঐ, পৃষ্ঠা ৪৫
২২ ঐ, পৃষ্ঠা ৪৭
২৩ ঐ, পৃষ্ঠা ৫২
২৪ ঐ, পৃষ্ঠা ৫৬
২৫ ঐ, পৃষ্ঠা ৫৬
২৬ আনিসুজ্জামান, মুনীর চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৪৭
২৭ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস : কয়েকটি দলিল। বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৬২। (একুশের ঘটনাপঞ্জী : কবির উদ্দিন আহমদ : হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলন, ১৯৫৩ থেকে উদ্ধৃত)
২৮ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস : কয়েকটি দলিল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৬৬ (ষড়যন্ত্রের গোড়ার কথা, এম শামসুল আলম, শহিদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৭২ থেকে উদ্ধৃত)
২৯ [সৈয়দ] আকরম হোসেন সম্পাদিত, মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আনোয়ার পাশা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২ (মুনীর চৌধুরীর জীবনকথা—রফিকুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৮)